ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 127- 134
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.278

তারাপদ রায়ের কবিতা: স্বতন্ত্র স্বর

মনোরঞ্জন উরাও, *গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.12.2025; Accepted: 28.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Tarapada Ray (1936–2007) was a distinguished poet of the Krittibas group. While contemporaries such as Sunil Gangopadhyay, Shakti Chattopadhyay, and Utpal Basu achieved wide popularity, Tarapada Ray's poetry remained on the margins of the reading public for a long time. Although his reputation later grew significantly as a writer of humorous prose, his identity as a poet remained largely overshadowed. This article analyzes Tarapada Ray's poetry as a distinctive voice within the context of modern Bengali poetry.
The principal characteristic of Tarapada Ray's poetry is his use of simple, colloquial, and indigenous language, consciously avoiding artificial poeticism, excessive ornamentation, and foreign influences. Humor functions as an important aesthetic strategy in his poetry—not in the aggressive form of satire or irony, but through self-mockery and absurdity, revealing human suffering, the crises of middle-class life, existential uncertainty, and moral conflict. Rejecting ego and poetic grandiosity, he places "destitution" at the center of his poetic vision, offering a perspective that is unique in modern Bengali poetry.
Through the fluid form of prose poetry, a sensitive engagement with everyday experience, and a focus on the lives of ordinary people as the core subject of poetry, Tarapada Ray demonstrates that poetry is not a matter of loud philosophical proclamation, but a simple expression of the inner truths of life. For this reason, his poetry remains relevant today, and he occupies an important place in Bengali literature as a poet with a distinct and individual voice.

Keywords: Tarapada Ray, Krittibas Group, distinctive voice, absurd humor, humor

তারাপদ রায় বাংলা সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য কৃত্তিবাসী কবি। তিনি কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর একজন অন্যতম সদস্য হলেও কৃত্তিবাসী কবিদের মধ্যে তার নাম সবসময় উচ্চারিত হয়নি। কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর অন্যান্য কবিদের তুলনায় যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় এবং উৎপল বসু যতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, তারাপদ রায়ের কবিতা পাঠকের কাছে ততটা সমাদৃত হয়নি। তবে, এক সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তারাপদ রায় বেশ পরিচিতি ছিল। তাঁর কবিতা, বিশেষত 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদ বাবু' এবং 'দারিদ্র রেখার নীচে', 'ছিলাম ভালবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন' কিছুটা জনপ্রিয়তা পায়, তবে পাঠকদের মধ্যে তার কবিতার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা তখনও পরিপূর্ণভাবে পায়নি। পরবর্তী সময়ে, তার কবিতার পাশাপাশি তিনি একজন হাস্যরসিক বা রম্যরচনাকার হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সহজ সরল লেখার জন্যই তাকে সবার কাছে আলাদা পরিচিত করে তোলে। তারাপদ রায়ের আত্মজীবনীমূলক রচনা

‘চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি’-র জন্য একসময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এই রচনাটি একদিকে যেমন তার ব্যক্তিগত জীবন ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিল, তেমনি পাঠকদের মধ্যে এক বিশেষ জায়গা তৈরি করেছিল।

কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর অগ্রগণ্য কবিদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বর এবং ভাষা ছিল। যাকে আমরা স্টাইল বলে থাকি। সুনীল, শক্তি, শরৎকুমার ও উৎপল-এর কবিতা পরপর সাজিয়ে রাখলে এবং কবির নাম তুলে নিলেও দিক্ষিত পাঠক ঠিকই বুঝতে পারবেন— কোনটি কার কবিতা। তারাপদ রায়ের কবিতাও তাই। তাঁর কবিতারও এক স্বতন্ত্র ভাষা আছে। স্বকীয় কণ্ঠস্বর আছে। তাতে ‘স্টাইলাইজেশন’ কম। বিদেশি কবিদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব কম। তিনি সম্পূর্ণ দিশি কবি। সাধারণ শব্দ ব্যবহার এতটাই অব্যর্থ যে, কবিতার ঐন্দ্রজালিক রহস্য ঠিকই আভাসিত হয়। নিজেকে নিয়ে নিজের চেহারাকে নিয়ে ঠাট্টা করা তারাপদ রায়ের এক বিশেষ ঝোঁক। কবিতায় এবং রম্যরচনায় এর অজস্র উদাহারণ পাওয়া যাবে। আমরা তাঁর একটি কবিতা লক্ষ্য করলে দেখব—

> “দাঁতাল শুয়োর নিয়ে খেলা করা,
> একমাত্র তোমাকেই তোমাকে মানায়,
> বদ্ধঘরে মুখোমুখি চকচকে আয়নায়
> নিজের ছায়ার সামনে পরিতৃপ্ত তারাপদ রায়।”[১]

শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় তারাপদ রায় বলেছেন—

> “আমি কখনও এমন কিছু লিখি না যা স্পষ্ট নয়, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, যা আমি নিজে জানি না বা বুঝি না। যা সহজ বোধগম্য নয় তা যেমন আমি লিখিনি, তেমনি আমি সাধারণত কবিতা লেখার চেষ্টা করেছি মুখের ভাষায়। যে ভাষায় আমরা প্রতিনিয়ত কথা বলি আমাদের সেই মৌখিক ভাষাকে আমি কবিতায় নিয়ে যেতে চেয়েছি।...আমি সচেতনভাবে, সাবালক হওয়ার পর থেকে চেষ্টা করেছি, এখনও চেষ্টা করছি, আমার নিজের মতো লিখতে, নিতান্তই নিজের ভাষায় কথা, নিজের তার মধ্যে অন্য কারো ছায়া, আমি কখনোই জ্ঞাতসারে পড়তে দিইনি।”[২]

তারাপদ রায়ের কবিতায় এক্সপেরিমেন্ট কম। শব্দ নিয়ে বিচিত্র কৌশল প্রায় চোখেই পড়ে না। অভিজ্ঞ দার্শনিকের মতো তিনি কখনই জীবনবিষয়ক নানান গুরুগম্ভীর কথা বলতে চাননি। খুব সহজ ভাবে তিনি তাকাতে চেয়েছেন জীবনের দিকে। সুখ, দুঃখ, অপমান, যন্ত্রণাবোধ সবকিছুই তিনি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গেক্রমে তাঁর ‘তদন্ত কমিশন’ কবিতাটি স্মরণ করা যেতে পারে—

> “আমাদের সাড়ে আটজনের সংসারে
> তিন জন মারা গেছে এক বছরের মধ্যে
> আমরা ভালো আছি।”[৩]

এক বছরের মধ্যে তিন জন মারা গেলেও ভালো থাকা যায়, জীবনের এই নিষ্ঠুর সত্যকে, এই বাস্তবতাকে এই হৃদয়হীন যান্ত্রিকতাকে কত সহজে, একেবারে ভড়ং কিংবা ভণিতা না করেই প্রকাশ করলেন তারাপদ। এবং কবিতাটির শেষ দুই লাইনে তিনি বাস্তবসম্মতভাবেই মানবিক—

> “তবু মোজা ছিড়ে গেলে কারো কথা মনে পড়ে,
> কই মাছ খেতে গেলে কারো কথা মনে পড়ে।”[৪]

তারাপদ রায় ছিলেন মজার কবি। মজার মজার কবিতা লিখতেন। সুকুমার রায়ের পর বাংলা কবিতায় তিনিই দ্বিতীয় কবি যিনি কবিতায় উদ্ভট রস-এর জোগান দিয়েছেন। ‘সাইকেল, গাধা ও ধোপার কাহিনি’ কবিতাটি উদ্ভট রসের। কবিতাটি হল—

"'একটা সাইকেল পেলে যাওয়া যেত ধোপাদের উজ্জ্বল দোকানে',
'ধোপার বাতিল মৃত গাধা শুধু এইটুকু শুনে,
হেসেছিলো অন্তরীক্ষ থেকে।
সে ছিলো অনেককাল
মনিবের নিত্যসঙ্গী ভাটিতে, দোকানে।
সে জানে, ভালোই জানে, উজ্জ্বলতা কি যে তার মানে
বিশেষত ধোপার দোকানে।"[৫]

এই কবিতাটিতে সুকুমার রায়ের 'ননসেন্স' কবিতার মতো একটি কাহিনি কিংবা গল্পসূত্র আছে। এখানে এক নিঃসঙ্গ ধোপার কথা বলা হয়েছে। যে হয় দোকানে, নয় ভাটিখানায় তাঁর দিনগুলো কাটাতো। গাধাই ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। এখানে গাধাটিও মৃত। ধোপার দোকান যে মোটেই উজ্জ্বল নয়, অন্তরীক্ষ থেকে 'বাতিল মৃত' গাধার হাসি থেকেই তা আমরা বুঝতে পারি। এই ধরনের কবিতা বাংলা ভাষায় খুব কম লেখা হয়েছে।

কবি তারাপদ রায়ের স্বতন্ত্রতা এখানেই যে তিনি তাঁর কবিতায় সাদাসিধে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করে গভীর ভাবনার প্রকাশ ঘটান। তাঁর কবিতায় কোনও ভারী শব্দ নেই, প্রতিটি শব্দ একটি স্ফটিকের মতো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। যেমন— 'সাহসিনী' কবিতায় কবি লিখেছেন,

"সাহসিনী/চায়ে বড় দিয়েছিলে চিনি/দুধ কম:/তবু ভালো, এই তো প্রথম/তোমার হাতের তৈরী উষ্ণ পানীয়ের/যতটুকু তাপ মেলে তারই স্বাদ ঢের।"[৬]

আবার 'কাঁসার গেলাস' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

"কাঁসার গেলাসে লিখে রেখেছিলে নাম/ পুরানো ধাতুর দাম/ সে গেলাস কবে একেবারে/ বিক্রি হয়ে গিয়েছে বাজারে। /আজকাল কারা পান করে, /তোমার নামের জল আজ কার ঘরে?"[৭]

'সাহসিনী' ও 'কাঁসার গেলাস' কবিতাটি নিঃসন্দেহে অস্ফুট প্রেম। 'ভ্রাম্যমাণ' কবিতাটি উদ্ভট-রস-এর। এরকমই উদ্ভট রসের কবিতা— 'ঘোড়া ও নাবালিকা'। এই রকম কবিতার আমরা কোনও আক্ষরিক অর্থ না খুঁজে শুধু নতুনত্ব বা রহস্যময়তার আস্বাদ অনুভব করব।

"ঘোড়া এসে উঠেছিল ছাদে
ছাদের চাঁদ ছিলো, ছিলো শিখা
নাবালিকা
ভয় পেয়েছিলো খুব ভয়ের সুবাদে
বয়সকালের ঘোড়া উঠেছিলো ছাদে।"[৮]

'বয়সকালের ঘোড়া'—আমরা তো ধরেও নিতে পারি— 'বয়সকালের ছোঁড়া?' নাবালিকা শিখা যখন ছাদে ছিল, আকাশে চাঁদ ছিল, তখনই ঘোড়া (পুরুষ) উঠে এসেছিল ছাদে। তাহলে কি কোনো নাবালিকা-অসম্মানের গল্প শোনাচ্ছেন কবি? কারণ— "শিখা/নাবালিকা/ঘোড়া আর চাঁদ দেখে গুণেছে প্রমাদ।"[৯] কিন্তু এই সম্ভাব্য গল্পটিকেও সুকৌশলে ভেঙে দেন তারাপদ। শেষপর্যন্ত কবিতার রহস্যময়তাই জিতে যায়। তারপর অবশ্য কিছু একটা ঘটে। এরকমই আরও একটা উদ্ভট কবিতা— 'X, Y বিষয়ে কবিতা'। এই কবিতায় তারাপদ রায় লেখেন— "X, Y দুইজন লোক, /যে কোন দুইজন লোক, X, Y গ্রাফের খাঁচায়/কখনো পাঁচঘর ওঠে, কখনো তিনঘর নেমে যায়।"[১০]

আবার 'কালু' নামে এক রহস্যময় লোককে নিয়ে দুটি কবিতা আছে তারাপদ রায়ের। একটির নাম 'কালু, আলো জ্বালো' আর একটির শিরোনাম 'ছুটির দিনের সকাল'। দুটি কবিতাই অ্যাবসার্ড এবং কিছুটা যেন রহস্যময়। প্রথম কবিতায়—অনেক রাতে, 'বড় গাড়ি চড়ে' কারা যেন আসে কালুর বাড়িতে। বৃষ্টির রাত—"এমন বৃষ্টির মধ্যে ঝুপঝাপ কারা/ভিজতে ভিজতে চলে এল?"[১১] কালুর বিড়াল খুব একটা পাত্তা দেয় না আগন্তকদের। 'তার একবার' চোখ জ্বলজ্বল করে'; তারপর হাই তুলে সে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপরে কবির যেন দুশ্চিন্তা, আগন্তুকদের আদৌ কালু অভ্যর্থনা জানাবে কি? "কালু কি অবাক হবে, নাকি কালু প্রস্তুত রয়েছে,/তার বিড়ালের মত সে তো মুর্খ নয়,/গভীর রাতের গাড়ি, বিশিষ্ট অতিথি—/সে হয়তো ভালই জানে/সে হয়তো জেগে বসে আছে।"[১২] কিন্তু কালুর ঘুম ভাঙে না। বৃষ্টিভেজা রাতে সে ঘুমিয়েই থাকে। শুধু 'জাহাজের মত গাড়ি' দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কবিতা শেষ হয় এইভাবে—

> "কালু ঘুমে অচেতন, (ওঠো, কালু, আলো জ্বালো)।/কালু ঘুমে অচেতন, (ওঠো কালু, দ্যাখো এসে)।/কালু শুয়ে থাকে, শুধু জ্বলজ্বলে চোখে।/একবার হাই তুলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে/কালুর বিড়াল।।"[১৩]

শেষমেশ কিছুই ঘটে না। কালু ঘুমিয়ে থাকে। বিড়াল ঘুমিয়ে থাকে। আর রহস্যময় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে দরজায়। নিঃসন্দেহে উদ্ভট কবিতার বিশিষ্ট নিদর্শন এই কবিতা।

'ছুটির দিনের সকাল' কবিতায় যেন চাপা, অবৈধ প্রেমের আভাস। ছুটির দিনের সকালে কালুদের বাড়িতে গেলে দেখা যায়, 'কালু তখনও কয়েদীদের মতো ডোরাকাটা পোশাক পরে ঘুমিয়ে'। কালু যেন সত্যি সংসারে এক কয়েদী। সব সময় তার ভয়— 'বৌ রাগ করবে'। কালু চলে যায়। তার বৌ এবং কবি দুজনে চা-পান চলে। তারপর—

> "আমি আস্তে আস্তে উঠি, বলি, 'আজ যাই।'/কালু কাগজ থেকে চোখ তুলে বলে, 'চললে'/কালুর বৌ আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়,/আমি রাস্তায় নামতে নামতে বলি, 'আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।/কালুর বৌ চমৎকার হেসে বলে, 'আর একদিন আসবেন'।"[১৪]

তারাপদ রায় সচেতনভাবে 'কবিত্ব' এবং 'অহমিকা' বর্জন করে 'নিঃস্ব' অর্জনের দিকে ঝুঁকেছিলেন, যা তাঁর কবিতাকে এক বিশেষ মানবিক সংবেদনশীলতা দিয়েছে। তিনি একজন সরকারি আমলা হয়েও মধ্যবিত্তের নিত্যদিনের সংগ্রামকে তাঁর সাহিত্যের কেন্দ্রে স্থাপন করেন এবং প্রমাণ করেন যে জীবিকা এবং কল্পনার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তাঁর 'দিন আনি দিন খাই' কবিতাটি অর্থনৈতিক টানাপোড়েনকে অস্তিত্ববাদী রহস্য হিসেবে চিত্রিত করে। যেখানে জীবন কেবল একটি অবিরাম এবং ব্যাখ্যাতীত প্রক্রিয়া।

তারাপদ রায়ের কবিতায় গভীর কোনও সত্যের উচ্চারণ নেই? বহির্বিশ্বকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করে যে গভীর সত্যকে তুলে আনেন, সেই সত্য কি নেই তারাপদ রায়ের কবিতায়? তিনি যে প্রকৃতই কবি তা বুঝে নিতে আমাদের একটুও অসুবিধে হয় না যখন আমরা পড়ি এইরকম কবিতা—

> "নদীর ভিতর থেকে উঠে এসে গ্রাম
> নদীর ভিতরে ডুবে যায়।
> মধ্যে থাকে দু-এক শতাব্দীকাল কিছু স্তব্ধ ছায়া
> জন্ম-মৃত্যু, সানাই ও গাছপালা কিশোর-কিশোরী,
> কলস ও কলসের জল
> উঠোনে উদোম শিশু হামা দেয় কাদামাটি মেখে
> হাওয়া এসে ছিঁড়ে দেয় কলাপাতা

গ্রাম ডুবে যায়।
নদীর ভিতরে গ্রাম, গ্রামের ভিতরে নদী
দু-এক শতাব্দীকাল কিছু স্তব্ধ ছায়া।”[১৫]

এই ধরনের প্রথাগত বিষয়ের কবিতা ছাড়াও তারাপদ বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কবিতা লিখেছেন যা, এক কথায় বলা যায়, বিচিত্র ধরনের কবিতা। তারাপদ রায় কীভাবে তাঁর কাব্যিক ভাষায় কৌতুক ও স্যাটায়ারকে ব্যবহার করে মধ্যবিত্ত জীবনের অপ্রিয় সত্য এবং অস্তিত্বের সংকটকে শিল্পিত করেছেন? এবং কেন তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদের তুলনায় ভিন্ন এক ‘স্ব’-কে কবিতার কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন যা অহমিকা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে ‘নিঃস্ব’ অর্জনকে প্রাধান্য দিয়েছে? তাঁর কবিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা হবে যে তাঁর লঘুতা কেবল হাস্যরস নয় বরং গভীর মানবিক সত্যকে উদ্ভাসিত করার একটি সূক্ষ্ম ও জটিল শৈল্পিক কৌশল।

ছন্দে তারাপদ রায়ের হাত পাকা, কিন্তু ছন্দ তাঁর প্রিয় আঙ্গিক নয়। হয়তো ছিল একদা, তবে জানিনা পরিণতির কোনও ধাপে আবার তা ফিরে আসবে কিনা। তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন বৈঠকী গালগল্পের মেজাজে। গদ্য কবিতার নতুন আঙ্গিকটি আবিষ্কার করার পর রবীন্দ্রনাথের একদা মনে হয়েছিল ছন্দোবন্ধ কবিতায় পরিবেশন করা যায় না এমন কিছু তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিজ্ঞতা, বিস্ময়, মুগ্ধতা, অস্ফুট প্রেমানুভূতি বা বেদনা ভাষা পেতে পারে। তারাপদ রায়ের গদ্য কবিতা আরও হালকা আরও তাচ্ছিল্যকর। এবং তারই উপযোগী তাঁর ভাষা ও ছন্দ। যেমন ঈশ্বরকে সম্বোধন করে হয়তো বলার জন্যই তিনি বললেন, ‘এই ফুলগুলি খুব ছোট’। ‘আজীবন সমস্ত জীবন’ কবিতায় কবি লিখেছেন—

“কিছু কিছু স্বপ্ন আছে,
যা সারাজীবন সঙ্গে সঙ্গে থাকে।
কিছু কিছু ভালোবাসা আছে
যা রক্তের সঙ্গে, চোখের জলের সঙ্গে
মিশে থাকে
আজীবন, সমস্ত জীবন।”[১৬]

এই একটি মাত্র শব্দ ‘যা’ দিয়েই কবি তারাপদ রায় কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। আবার ‘রক্তচাপ’ কবিতায় কবি লিখেছেন—

“সেই যারা
কোদাল দরকার হলে এসে কুড়োল চাইতো
কিছুতেই ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলতো না।”[১৭]

তারাপদ রায় কবি ছাড়াও যে একজন বড়ো মাপের দার্শনিক ছিলেন, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু আসল কথা হল, কবি তারাপদ রায়ের কবিতা কখনও দর্শন থেকে পৃথক কোনও জায়গার কথা বলেও না। সাধারণ ঘটনার মধ্যেও দার্শনিক বিস্তৃতি তিনি দেখতে পেয়েছেন বলেই, তাঁর কবিতায় সেই বিস্তার এসেছে। এই দর্শন তাঁর ভিতরে এত গভীর ভাবে ছিল, যে তার প্রকাশে বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই। নিজের মধ্যেই একটা আলাদা জীবনের বৃত্ত তৈরি করেছিলেন তারাপদ।

নিজের জীবন দিয়ে যা বুঝতেন, যা দেখতেন তাই-ই সহজ ভাষায় হাজির করতেন। ‘এক জন্ম’-এর মতো এক অদ্ভুত জীবন দর্শনের পাশাপাশি রাখা যায় ‘কাঁসার গেলাস’ কবিতাটি। যেখানে অতীতের দিকে ফিরে দেখা নিজেকে। তার সঙ্গেই মিলিয়ে দেখা বর্তমান ‘আমি-কে’। কবিতার হাত ধরেই যেন নিজেকে খুঁজতেন তিনি। জোর করে কাঠিন্য নয় বরং নিজের সাধারণ জীবনের মতোই আনন্দ করে লেখা প্রতিটি লাইন। সেই পথেই

হাজির হন আরও একজন– মিনতি রায়। কবি নিজেকে নিয়েও কম কৌতুক করেননি। সবুজ পাঞ্জাবি গায়ে সবুজ পাশপোর্ট হাতে মূল শিয়ালদা স্টেশনে ছেঁড়াতালি জুতো পায়ে যে কিশোরটি এসে পৌঁছেছিল, তাঁকে অবশ্য কলকাতা মনে রাখেনি–কিন্তু কবি ভোলেননি আদৌ। তাই নিজেকে নিয়ে তাঁর অজস্র কৌতুক।

> "এক নম্বর বোকা
> দু নম্বর বোকাকে ডেকে বললো,
> সিনারিটা একবার তাকিয়ে দ্যাখো।"[১৮]

কবিতায় 'হিউমার' আনার কারণেই তারাপদ রায় কবি হিসেবে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। মনে রাখা দরকার যে 'হিউমার' নয়, 'স্যাটায়ার' বা 'আয়রনি' নয়, 'হিউমার' হল নির্মল হাসি, যা অপরের মুখ ম্লান করে। শ্রেষ্ঠ 'হিউমরিস্ট' তিনিই, যিনি নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য গল্পকার শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পগুলি স্মরণীয়। নিজের নাম নিয়ে রসিকতা করার সুযোগও শিবরাম ছাড়েননি। তারাপদ রায় তাঁর অনেকগুলি রম্যরচনায় শিবরাম চক্রবর্তীর নামোল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, তিনিও তাঁর কবিতায় নিজেকে নিয়ে রসিকতা করেছেন এবং এদিক থেকে তাঁকে 'বাংলা কবিতার শিবরাম' বলা যেতে পারে–

> "টি, আই, টি অর্থাৎ তারাপদ ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের
> একজন ভালো চেয়ারম্যান চাই।
> মজা নালা, বোকা রাস্তা, বাজপড়া বাড়ি
> তারই মাঝখান দিয়ে দু' একটা সোজা রাস্তা চাই,
> চাই লম্বা, নাকউঁচু, স্মার্ট ম্যানসন
> টি, আই, টি' র জন্যে জনসাধারণের সহযোগিতাও চাই।"[১৯]

ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে তারাপদ লেখেন— "ফিলিপ্স অসরামের চেয়ে ঢের ভালো/এখনো তোমার সূর্য, এত লক্ষ বৎসরেও ফিউজ হলো না?"[২০] এরকম প্রকাশভাবনাতেও, নিঃসন্দেহে, বৈচিত্র্য আছে। স্বয়ং তারাপদই বলেছিলেন, তাঁর জীবন কোনও কবির জীবন নয়। বরং আর পাঁচজনের মতোই সামান্য গৃহস্থের সংসার। তবে সে তো পরের কথা। ষাটের দশকে যখন বেশ কিছু তরুণ বাংলা সাহিত্য, কবিতাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে, তখন সেই স্বপ্নের নদীতে ভিড়েছিলেন তিনিও। সুনীল, শক্তি, শরৎকুমার, সন্দীপনের সঙ্গে শুরু হল উত্তাল যাপন। আর সেসব হুল্লোড়ের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন তারাপদ রায় নিজে। যেমন গলার স্বর, তেমন তাঁর গল্পের ভাঁড়ার। একটা সময় তারাপদ রায়ের বাড়িতেই বসত বন্ধুদের আড্ডার আসর।

নিজের মধ্যেই একটা আলাদা জীবনের বৃত্ত তৈরি করেছিলেন তারাপদ। সহজ, সাবলীল সেই ভাষা। এই সরলতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে এক গভীর ব্যঙ্গাত্মক স্বর। যেমন, "আমাকে বাচাল যদি করেছো মাধব, বন্ধুদের করে দিও কালা।"[২১] এই উক্তিটি লৌকিক বা সাধারণ কথোপকথনের ভঙ্গিমায় রচিত হলেও, এর গভীরে লুকিয়ে থাকে আধুনিক মানুষের যোগাযোগের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং নিজের বিচ্ছিন্নতাকে সুরক্ষিত রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই সহজ ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি পাঠকের উপর আনুষ্ঠানিক কাব্যিক কাঠামোর বোঝা না চাপিয়ে সরাসরি অনুভূতিতে আঘাত করতে সক্ষম হন।

তার মধ্যেও নিজস্ব দর্শন, যাপনের ভিড়। আড্ডাছলেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তোমার প্রতিমা'। তখনও মহিম হালদার স্ট্রিটেই থাকতেন তারাপদ রায়। প্রথম কবিতার বইয়ের ভেতরেই থেকে যায় মুদ্রণ প্রমাদ। 'মহিম হালদার স্ট্রিট'-এর 'মহিম' বদলে যায় 'মহিষ'-এ। যা নিয়ে পরে ঠাট্টা করতেও ছাড়েননি অনেকে। এসবের ভেতর দিয়েই স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছিল তাঁর কবিতা।

তারাপদ রায় সচেতনভাবে প্রচলিত ছন্দ বা কাঠামো থেকে সরে এসে গদ্যের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমা গ্রহণ করেন। তাঁর কবিতা প্রায়শই তাঁর রম্যরচনার গদ্যের মতো সাবলীল, যা পাঠককে মুহূর্তেই আকৃষ্ট করে। এই গদ্য-কবিতারীতি বাংলা কাব্যে এক স্বাতন্ত্র্য কবির মর্যাদা এনে দিয়েছে, যেখানে পরিহাস-বিদ্রুপ মিশ্রিত বাকধারা শিল্পের নতুন পথ উন্মোচন করেছে। তিনি এই শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, কবিতা মহৎ বা উচ্চতর শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটি দৈনন্দিন শব্দ এবং অনুভূতিকে তার মহত্বে স্থাপন করে।

তারাপদ রায় মধ্যবিত্তের জীবনকে কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন, কারণ তিনি নিজেই ছিলেন সেই জীবনের অংশ। তিনি নিজের জীবনকে নেহাতই 'ঘরগৃহস্থী' বলে দাবি করেন এবং বলেন। এই স্ব-স্বীকৃত সাধারণত্বের মধ্যে তিনি এক দার্শনিক সত্য আবিষ্কার করেন। পরিশ্রমে ও কল্পনায় কোনও পার্থক্য থাকে না 'কোন প্রভেদ থাকে না জীবিকা ও কবিতায়'। এই অবস্থান বাঙালি মধ্যবিত্তের মননে শিল্প ও কর্মজীবনের সংজ্ঞাকে নতুন করে গড়ে তোলে। তিনি প্রমাণ করেন যে কবিত্ব কোনও উচ্চমার্গীয় বৈশিষ্ট্য নয় বরং তা জীবনের অভেদত্বে বিরাজ করে। একজন কবি যখন নিজেই সেই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ, তখন তাঁর মধ্যবিত্ত জীবনচিত্রটি কেবল বাইরের পর্যবেক্ষণ নয়, এটি ভেতরের এক স্বীকারোক্তি, যা তাঁর কবিতাকে এক বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যতা ও গভীরতা দান করে।

তারাপদ রায়ের কবিতা একেবারেই আলাদা ধরনের। তাঁর কবিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ঘটনা, হাসি-কান্না, অসম্পূর্ণতা আর অবহেলিত মুহূর্তগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মানুষের গভীর সত্য। তাঁর কবিতার ভাষা খুব সহজ সরল হলেও, তার ভেতরে আছে মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ, দেশভাগের যন্ত্রণা, শহরের ক্লান্ত জীবন আর মানুষের নৈতিক টানাপোড়েনের অনুভব। তারাপদ রায়ের কবিতায় হাসি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই হাসি শুধু আনন্দের জন্য নয়। তিনি এই হাসির মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্যজগত এমনকি নিজেকেও প্রশ্ন করেছেন। অনেক সময় তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে আমরা হেসে উঠি, কিন্তু সেই হাসির পরেই মনে হয়– এর ভেতরে লুকিয়ে আছে গভীর কষ্ট বা বেদনা। এই হাসি আর কষ্ট একসঙ্গেই তাঁর কবিতাকে আলাদা করে তোলে।

কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবি হয়েও তিনি অন্যদের মতো বড় বড় ভাবনা বা জটিল ভাষার পথে হাঁটেননি। তিনি কবিতার কেন্দ্রে এনেছেন সাধারণ মানুষকে, যে মানুষটি কখনও অফিসে কাজ করে, কখনও উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখনও সংসারের দায়িত্বে জর্জরিত, আবার কখনও ঈশ্বরকেও নিয়ে হালকা ঠাট্টা করে। অনেক সময় কবি নিজেই তাঁর কবিতার চরিত্র হয়ে ওঠেন। এই নিজেকে নিয়ে হাসতে পারার ক্ষমতাই তাঁর কবিতাকে আলাদা পরিচয় দিয়েছে। অনেকেই তারাপদ রায়কে চেনেন রম্য লেখক হিসেবে। এতে তাঁর কবিসত্তা কিছুটা আড়ালে থাকে ঠিকই, কিন্তু মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায় তাঁর কবিতায় সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি সম্পূর্ণ হয় না। তিনি দেখিয়েছেন, কবিতা লেখার জন্য বড় তত্ত্ব বা জটিল দর্শন প্রয়োজন নেই। দরকার জীবনের দিকে সংবেদনশীল চোখে তাকানো এবং সহজভাবে সত্য কথা বলার সাহস।

সব শেষে বলা যায়, তারাপদ রায়ের কবিতা শুধু আনন্দ দেয় না, আমাদের ভাবনাকেও নাড়িয়ে দেয়। তাঁর কবিতার হাসির আড়ালে যে প্রশ্নগুলো লুকিয়ে থাকে, সেগুলিই তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড় শক্তি। এই কারণেই তাঁর কবিতা আজও নতুন মনে হয় এবং বাংলা কবিতায় তিনি একজন সত্যিকারের স্বতন্ত্র কবি হিসেবে স্মরণীয়।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ট কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২৯।
২. তদেব, পৃ. ৮।
৩. তদেব, পৃ. ৮২।
৪. তদেব, পৃ. ৮২।
৫. তদেব, পৃ. ৩৯।
৬. তদেব, পৃ. ৪৫।
৭. তদেব, পৃ. ৪৫।
৮. তদেব, পৃ. ৪৯।
৯. তদেব, পৃ. ৪৯।
১০. তদেব, পৃ. ৪৯।
১১. তদেব, পৃ. ৭৮।
১২. তদেব, পৃ. ৭৮।
১৩. তদেব, পৃ. ৭৯।
১৪. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ট কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১০৭।
১৫. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ট কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৭৭।
১৬. রায়, তারাপদ। রচনাসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড। লালমাটি প্রকাশন, সম্পাদনা নিমাই গরাই, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৪৭।
১৭. তদেব, পৃ. ৪৫৩।
১৮. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ট কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৬০।
১৯. রায়, তারাপদ। রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড। লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বইমেলা ২০১৫, পৃ. ৪৮৪।
২০. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ট কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩০।
২১. রায়, তারাপদ। শ্রেষ্ট কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩৮।